লীলাবতী

হুমায়ূন আহমেদ

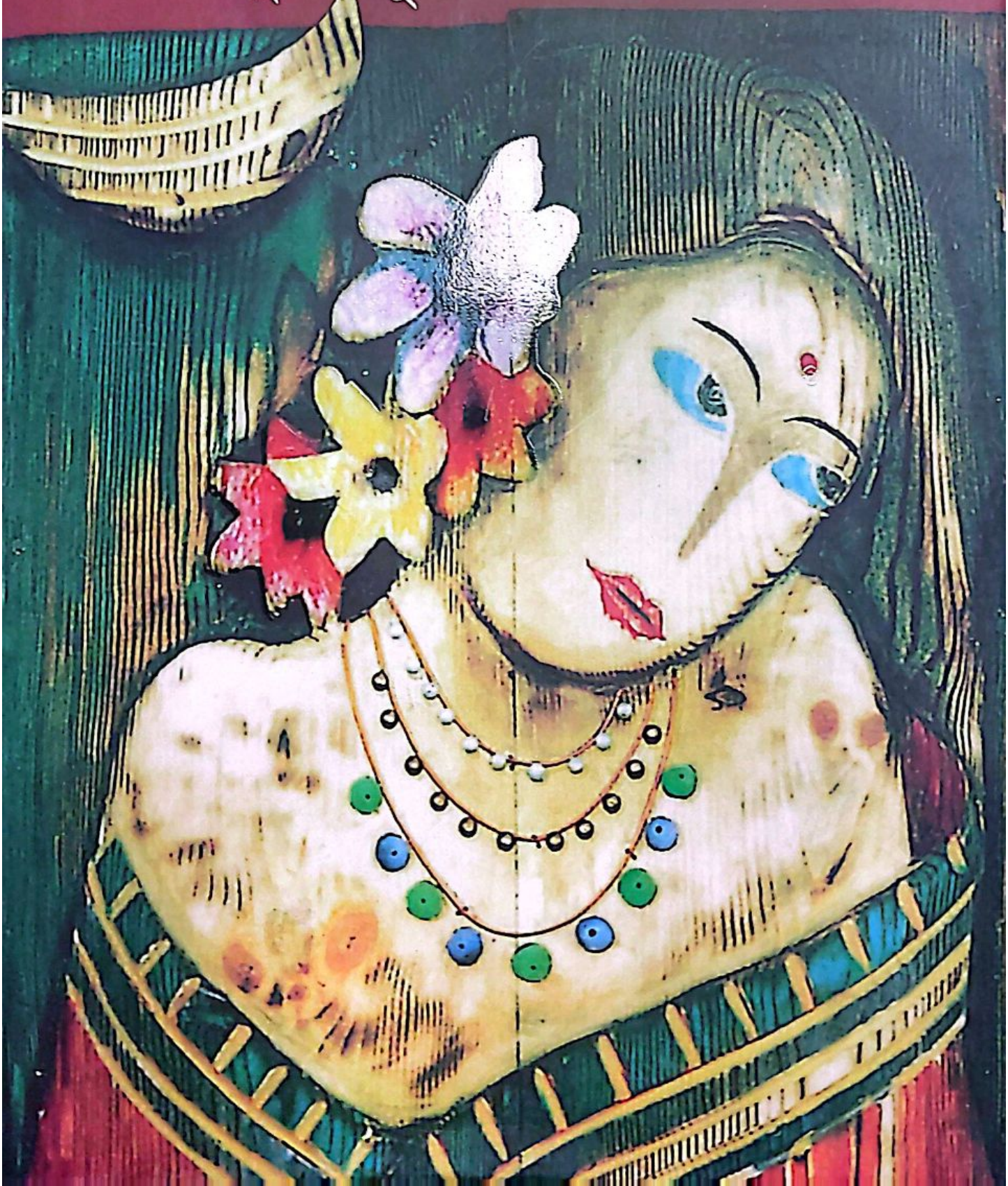

একটি পুকুরের মধ্যস্থলে একটি জলপদ্ম ফুটিয়াছে। জলপদ্মটি পানির পৃষ্ঠদেশ হইতে এক ফুট উপরে। এমন সময় দমকা বাতাস আসিল, ফুলটি তিন ফুট দূরে সরিয়া জল স্পর্শ করিল। পুকুরের গভীরতা নির্ণয় করো।

(*লীলাবতী*)

এই ধরনের প্রচুর অংক আমি আমার শৈশবে পাটিগণিতের বইয়ে দেখেছি। অংকের শেষে লীলাবতী নামটি লেখা। ব্যাপারটা কী ? লীলাবতী মেয়েটি কে ? তার সঙ্গে জটিল এইসব অংকের সম্পর্ক কী ?

যা জানলাম তা হচ্ছে— সপ্তম শতকের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের একমাত্র কন্যার নাম 'লীলাবতী'। মেয়েটির কপালে বৈধব্যযোগ— এই অজুহাতে কন্যাসম্প্রদানের আগে আগে বরপক্ষ মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেয়। লীলাবতী যখন গভীর দুঃখে কাঁদছিল তখন ভাস্করাচার্য বললেন, 'মা গো, তোমার জন্যে কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই, তবে পৃথিবীর মানুষ যেন বহু যুগ তোমাকে মনে রাখে আমি সেই ব্যবস্থা করছি।' তিনি তাঁর বিখ্যাত গণিতের বইটির নাম দেন 'লীলাবতী'।

গল্পটি আমাকে এতই অভিভূত করে যে, একরাতে লীলাবতীকে স্বপ্নেও দেখি। এই নামটা মাথার ভেতর ঢুকে যায়। অনেক দিন ইচ্ছা ছিল স্বপ্নে দেখা মেয়েটিকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখব। নাম দেব 'লীলাবতী'। ভালো কথা, আমার লীলাবতীর গল্প কিন্তু ভিন্ন। আমার উপন্যাসের লীলাবতীর বাবার নাম ভাস্করাচার্য না, সিদ্দিকুর রহমান। তিনি সাধারণ একজন মানুষ। অংকবিদ না।

পূর্বকথা

আমার শৈশবের একটি অংশ কেটেছে মোহনগঞ্জে, আমার নানার বাড়িতে। ছায়াময় একটি বাড়ি, পেছনে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর 'সারদেয়াল'— পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। সব কিছুই রহস্যময়। সন্ধ্যাবেলায় সারদেয়ালে ছায়ামূর্তিরা হাঁটাহাঁটি করে। গভীর রাতে বাড়ির ছাদে ভূতে ঢিল মারে। কেউ তেমন পাত্তা দেয় না। অশরীরী কিছু যন্ত্রণা তো করবেই। এদেরকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক না। মূলবাড়ি থেকে অনেক দূরে বিশাল এক তেঁতুলগাছের পাশে টাট্টিখানা। সন্ধ্যার পর যারা টাট্টিখানায় যায় তারা না-কি প্রায়ই তেঁতুলগাছে পা ঝুলিয়ে 'পেততুনি' বসে থাকতে দেখে।

দিনমানে অন্য দৃশ্য। বাড়ির কাছেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠভর্তি বক। আমার নানাজান আবুল হোসেন শেখ দোনলা বন্দুক হাতে বক শিকারে বের হন। আমি তাঁর সঙ্গী। ছররা বন্দুকের গুলি হলো। অনেকগুলি বক একসঙ্গে মারা পড়ল। তাদের গায়ের ধবধবে পালক রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে— আমি চোখ বড় বড় করে দেখছি। মাথার উপর মৃত বকদের সঙ্গীরা ট্যা ট্যা শব্দে ঘুরছে, অদ্ভুত সব দৃশ্য।

নানার বাড়ির স্মৃতি মাথায় রেখেই *লীলাবতী* উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম। সেই সময়ের রহস্যময়তাকে ধরার চেষ্টা। লেখাটা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছিল 'অন্যদিন' পত্রিকায়। কোনো ধারাবাহিক লেখাই আমি শেষ করতে পারি না। খেই হারিয়ে ফেলি। আগ্রহ কমে যায়। *লীলাবতীর* ক্ষেত্রেও তাই হলো। একসময় লেখা বন্ধ করে দিলাম। অন্যদিন-এর সম্পাদক মাজহারকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, ভালো লেখা যত্ন নিয়ে লিখতে হয়, তাড়াহুড়া করা যায় না। তুমি মন খারাপ করো না। একসময় এই লেখা আমি শেষ করব।

আমি আমার কথা রেখেছি। বইমেলায় *লীলাবতী* বের করতে পেরে মাজহার নিশ্চয়ই খুশি। আমিও খুশি। লেখাটা সিন্দাবাদের ভূতের মতো অনেকদিন ঘাড়ে চেপে ছিল— এখন নেমে গেছে।

লীলাবতী উপন্যাসের সব চরিত্ররা ভালো থাকুক। তাদের প্রতি এই আমার শুভকামনা।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

রেললাইনের উপর একটা বক বসে আছে। মেছো বক। এ ধরনের বক বিলের উপর উড়াউড়ি করে। অল্প পানিতে এক ঠ্যাঙ ডুবিয়ে মাছের সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের ডাঙায় আসার কথা না। আর যদি আসেও গম্ভীর ভঙ্গিতে রেললাইনে বসে থাকার কথা না। সিদ্দিকুর রহমান বিস্মিত চোখে বকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর ঘটনাটা কী ? এ কী চায় ?

বকটা ধবধবে সাদা। পানির বকের পালক সাদাই হয়। সারাক্ষণই পানিতে ডোবাডুবি করছে। পালকে ময়লা লেগে থাকার কোনো কারণ নেই। ডাঙার বকের পালক এত সাদা না— বাদামি রঙ। মেছো বক পানিতে যেমন এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে থাকে, রেললাইনের উপরও এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নড়াচ্ছে না, শরীর নড়াচ্ছে না, স্থির দৃষ্টি। সিদ্দিকুর রহমানের বিস্ময় আরো প্রবল হলো, বকটা কী দেখছে ? বিলের পানিতে এভাবে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার অর্থ আছে— মাছের গতিবিধি লক্ষ করা। এখানে বকটার একদৃষ্টিতে রেললাইনের পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থ কী ? সে কি রেললাইনের পাথর দেখছে ?

ঝিকঝিক শব্দ আসছে। ট্রেন চলে এসেছে। সিদ্দিকুর রহমান যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে ট্রেন দেখা যাচ্ছে না। ঘন জংলায় আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ট্রেন দেখা যাবে। বকটা এখনো নড়ছে না। রেললাইনের কম্পন তার অনুভব করার কথা। ধ্যান ভঙ্গ হবার সময় এসে গেছে। সিদ্দিকুর রহমান বুকের ভেতর সামান্য চাপ অনুভব করলেন। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তাঁর এরকম হয়। বুকে চাপ ব্যথা বোধ হয়। নিঃশ্বাসে কষ্ট হয়।

রেলের ইঞ্জিনটা এখন দেখা যাচ্ছে। কয়লার ইঞ্জিন। বুনকা বুনকা ধোঁয়া ছাড়ছে। কী সুন্দর দৃশ্য! বকটাকেও দেখা যাচ্ছে। বক আগের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। সিদ্দিকুর রহমান অস্থির বোধ করলেন। 'হুশ! হুশ!' শব্দ করে বকটাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে কিন্তু গলা কেমন যেন আটকে আছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বুকে চাপ ব্যথা। তিনি তাকালেন রেলের ইঞ্জিনের

দিকে। ভালো স্পিড দিয়েছে। ট্রেন ছুটে যাচ্ছে বকটার দিকে। সিদ্দিকুর রহমানের হঠাৎ মনে হলো, তিনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গাঢ় ঘুমে তার চোখের পাতা নেমে এসেছে। চারদিকে অদ্ভুত এক শান্তি-শান্তি নীরবতা। বাতাস মধুর ও শীতল। বুকের ব্যথাটা নেই। নিঃশ্বাসের কষ্ট নেই।

একসময় তিনি চোখ মেললেন। অবাক হয়ে দেখলেন মাঠের উপর তিনি লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর বাঁ-দিকে প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। গাছটার ছায়া পড়েছে তাঁর শরীরে। ছায়াটা এমনভাবে পড়েছে যেন মনে হচ্ছে তিনি একটা ছায়ার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর চোখের সামনে আশ্বিন মাসের মেঘশূন্য আকাশ। আকাশে দু'টা চিল উড়ছে। অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে। তাদের দেখাচ্ছে বিন্দুর মতো। তিনি উঠে বসলেন।

ফাঁকা মাঠ। আশেপাশে কেউ নেই। থাকার কথাও না। রেললাইনের উপর বকটা দাঁড়িয়ে নেই। সে ট্রেনের নিচে চাপাও পড়ে নি। চাপা পড়লে তার রক্তমাখা শরীর পড়ে থাকত। সিদ্দিকুর রহমান দুই হাতে ভর দিয়ে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছে। রেললাইনের ওপাশের জলে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। কয়েকটা ক্যাচক্যাচি পাখি তার পায়ের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। তিনি চাপা গলায় বললেন— 'হুশ! হুশ!' সেইসঙ্গে ডান পায়ে মাটিতে বাড়িও দিলেন। পাখিগুলি একটু দূরে চলে গেল— তবে ভয় পেয়ে উড়ে চলে গেল না। ক্যাচক্যাচি পাখিগুলি চড়ুই পাখির মতোই সাহসী। এরা মানুষের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। ধূসর বর্ণের পাখি। চোখ হলুদ। সারাক্ষণ ক্যাচক্যাচ করে বলেই নাম ক্যাচক্যাচি পাখি। তাদের আরো একটা বিশেষত্ব আছে— এরা সাতজনের একটা দল বানিয়ে থাকে। ক্যাচক্যাচি পাখির ঝাঁকে সবসময় সাতটা পাখি থাকবে। সাতের বেশিও না, কমও না। যদি কখনো কেউ দেখে দলে সাতটার কম পাখি আছে, তাহলে তার ঘনিষ্ঠ কোনো একজনের মৃত্যু ঘটে। অর্থহীন প্রচলিত প্রবাদ, তার পরেও ক্যাচক্যাচি পাখি দেখলেই সবাই পাখি গোনে। সিদ্দিকুর রহমানও গুনতে শুরু করলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। একটা পাখি তো কম! তিনি আবারো গুনলেন। পাখি ছয়টা। এর মানে কী ? পাখি ছয়টা কেন ?

ধুলাবালির উপর বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তাঁর উঠতেও ইচ্ছা করছে না। বরং আবারো শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত শুয়ে থাকলে মন্দ হয় না। সন্ধ্যা মিলাবে। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়বে। আজ চাঁদের নয় তারিখ, চাঁদের আলো আছে। সেই আলো কুয়াশায় পড়বে। কুয়াশাকে মনে

হবে চাঁদের আলোর হাওর। সেই হাওরের ভেতর দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া। খোলা মাঠে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নানান বিষয়ে চিন্তা করতে খারাপ লাগার কথা না। তাঁর বয়স সাতান্ন। এই বয়সে মানুষ পার করে আসা জীবনের কথা চিন্তা করে। সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করে। কোনো হিসাবই মেলে না। এই বয়সটা হিসাব মেলানোর জন্যে ভালো না।

সিদ্দিকুর রহমান চারদিক দেখে নিয়ে আবারো শুয়ে পড়লেন। পাঞ্জাবিতে ধুলা যা লাগার লেগে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে গরম পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে। বড় এক বালতি গরম পানিতে সামান্য কিছু কর্পূরদানা ছেড়ে দিয়ে আরাম করে গোসল। পানিতে কর্পূর দিয়ে গোসলের অভ্যাস তিনি পেয়েছেন তাঁর প্রথম স্ত্রী আয়নার কাছ থেকে। কর্পূর দিয়ে গোসলের জন্যে আয়নার শরীরে কর্পূরের গন্ধ লেগে থাকত। কাপড়ে কর্পূরের গন্ধ লাগলে কাপড় বাসিবাসি মনে হয়। মানুষের গায়ে এই গন্ধ আবার অন্যরকম লাগে। আয়না কতদিন আগে চলে গেছে, কিন্তু তার অভ্যাস রেখে গেছে। মানুষ কখনো পুরোপুরি চলে যায় না। কিছু-না-কিছু সে রেখে যায়।

তিনি আয়নার চেহারা মনে করার চেষ্টা করলেন। চট করে চেহারা চোখে ভেসে উঠল। এটাও একটা আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা। আগে অনেকবার চেষ্টা করেছেন, চেহারা মনে করতে পারেন নি। লম্বা মুখ, সরু কপাল, বড় বড় চোখ। চোখের রঙ বাদামি। একটা কিশোরী মেয়েকে শাড়ি পরিয়ে বড় করার চেষ্টা করলে যেমন দেখায় তাকে সেরকম দেখাচ্ছে। সে তরুণীও না, কিশোরীও না। দুয়ের মাঝামাঝি থেকেই আয়না তার ক্ষুদ্র জীবন শেষ করে গেল। আফসোসের ব্যাপার। খুবই আফসোসের ব্যাপার।

নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি যখন প্রথম বাড়িতে ঢোকেন তখন তাঁর দাদিজান ফুলবানু জীবিত। বুড়ির বয়স সত্তুরের উপরে। মেরুদণ্ড বেঁকে গেলেও শক্তসমর্থ শরীর। কানে শুনতে পান না কিন্তু চোখে খুব ভালো দেখেন। নতুন বউকে দেখে ফুলবানু বিরক্ত মুখে বললেন— শুনছি বউ হেন, বউ তেন। কই গায়ের রঙ তো ময়লা! ভালো ময়লা। তিন রাইজ্য খুঁইজ্যা কী বউ আনল ?

সিদ্দিকুর রহমানের এক ফুপু বললেন, আম্মা আপনি কী বলেন ? কী সুন্দর চাপা রঙ!

ফুলবানু বললেন, হাতের আর মুখের চামড়ার রঙ কোনো রঙ না। পেটের চামড়ার রঙ আসল। পেটের চামড়া দেখছো ? ও নতুন বউ, শাড়ির আঁচলটা টান দিয়া পেট দেখাও।

নতুন বউ দাদিজানের কথা শুনে কেঁদেকেটে অস্থির।